জাতির উদ্দেশে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিদায়ী ভাষণের খসড়া

প্রিয় দেশবাসী,

শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, নারী-পুরুষ, নবীন-প্রবীণ—আপনাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক সালাম ও গভীর শ্রদ্ধা।

আসসালামু আলাইকুম!

শুরুতেই আমি বাংলাদেশের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দীর্ঘ ১৭ বছর পর একটি উৎসবমুখর, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য। এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ, ভোটার, রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সম্মিলিতভাবে একটি প্রশংসনীয় নজির সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নির্বাচন কেমন হওয়া উচিত—এই নির্বাচন তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকবে।

প্রিয় দেশবাসী,

বিগত ১৮ মাস আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন শেষে, একটি নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রাক্কালে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আজ আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য উপস্থিত হয়েছি।

আজ বিদায়ের দিনে ৫ আগস্টের কথা স্মরণ করে আপনাদের কিছু কথা বলব। কী মহা মুক্তির দিন ছিল সেদিনটি! সে কী আনন্দের দিন! বাংলাদেশিরা দেশে-বিদেশে যে যেখানে ছিল আনন্দে চোখের পানি ফেলেছিল। দৈত্যের গ্রাস থেকে তরুণ ছাত্রছাত্রীরা দেশকে বের করে এনেছে। দেশ মুক্ত হয়েছে। কিন্তু দেশ সম্পূর্ণ অচল। অচল এই দেশটিকে কীভাবে সচল করা যাবে সেটা ছিল সবার মনে।

অভ্যুত্থানের ছাত্রনেতারা ঠিক করলো দেশকে সচল করার জন্য একটি সরকার লাগবে। সরকার গঠন ও চালাবার জন্য তারা আমাকে খবর দিলো। আমি তখন বিদেশে। আমি দায়িত্ব নিতে রাজি না। তারা জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের কথা বলে আমাকে রাজি করালো। ১৮ মাস পর এখন আমার যাওয়ার পালা।

আমি আজ আমার কাজ হতে বিদায় নিতে আপনাদের সামনে এসেছি।

আমাদের প্রথম কাজ ছিল দেশকে সচল করা। এটা ছিল সবচাইতে কঠিন কাজ। যারা দেশকে লুটেপুটে খেত তারাই দেশের এই যন্ত্র চালাতো। তাদের একান্ত অনুগত লোক নিয়ে অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সবাই পালিয়েছে। বড় কর্তা পালিয়েছে। মাঝারি কর্তা পালিয়েছে। অন্যরা ভোল পাল্টিয়েছে। অথবা আত্মগোপনে চলে গেছে।

কেউ নানাজনের সুপারিশ নিয়ে আসছে তারা অভ্যুত্থানের গোপন সৈনিক ইত্যাদি। সরকারের ভেতরে যারা পালিয়ে যায়নি তাদের মধ্যে কাকে বিশ্বাস করবেন, কাকে করবেন না- এটি মহাসংকট হয়ে দাঁড়াল। যতই মৃতদেহের, অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন দেহের সন্ধান আসছিল ততই তারা চিহ্নিত হচ্ছিল।

সেই থেকে ১৮ মাস চলে গেছে। অবশেষে ১২ই ফেব্রুয়ারি আসলো। দেড় যুগ পর দেশে একটি জাতীয় নির্বাচন এবং ব্যাপক সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য সর্বসম্মত জুলাই সনদের ওপর

গণভোট অনুষ্ঠান হলো। এই নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশ, দেশের সর্বত্র একটা ঈদের পরিবেশ ছিল যা আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনে যারা জয়ী হয়েছেন তাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা পরাজিত হয়েছেন তাদেরকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। হার-জিতই হলো গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। যারা জয়ী হয়েছেন তারা মোট ভোটের প্রায় অর্ধেক পেয়েছেন। যারা জয়ী হতে পারেননি তারাও মোট ভোটের অর্ধেক পেয়েছেন। যারা জয়ী হতে পারেননি তারা এই জেনে আশ্বস্ত হবেন যে প্রায় অর্ধেক ভোটার আপনাদের ওপর আস্থা রেখেছে। আগামী দিন নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করবে- এর মাধ্যমে আমাদের ১৮ মাসের দায়িত্বের সমাপ্তি হবে।

চব্বিশের জুলাই মাসে বাংলাদেশের মানুষ এক অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তাদের মুক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও মর্যাদার দাবি উচ্চারণ করেছিল। সেই সময় দেশ একটি গভীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও মানবিক সংকটে নিপতিত ছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল, গণতন্ত্র হয়েছিল ধুলিস্যাৎ, ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত।

ঠিক সেই সংকটময় সময়ে আমাকে আহ্বান জানানো হয়েছিল—একটি লক্ষ্য সামনে রেখে। বাংলাদেশকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর জন্য তিনটি দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সংস্কার। বিচার। এবং নির্বাচন।

আমি ও আমার সহকর্মীরা—সবাই আমরা সেই অঙ্গীকার রক্ষার চেষ্টা করে গেছি। কোথায় কতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি, কোথায় ব্যর্থ হয়েছি সে বিচারের ভার আপনাদের ওপর থাকলো।

আমাদের প্রচেষ্টায় কোনো ঘাটতি ছিল না। আমরা মানবতাবিরোধী অপরাধ, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিচার প্রক্রিয়াকে রাজনীতি ও প্রতিশোধের ঊর্ধ্বে রেখেছি। আমরা ভঙ্গুর প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, আর্থিক সংস্কারে হাত দিয়েছি—যাতে ভবিষ্যতে কোনো সরকার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেকে স্থাপন করতে না পারে। আর সর্বোপরি, আমরা একটি উৎসবমুখর, অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ, পরিচ্ছন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করেছি, যার মাধ্যমে জনগণ আবার তাদের ভোটাধিকার ফিরে পেয়েছে।

এই নির্বাচন কেবল একটি ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নয়—

এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নতুন অভিযাত্রার সূচনা;

নতুন বাংলাদেশের জন্ম।

এই অর্জনের পেছনে যাঁরা ছিলেন—

জুলাইয়ে রাস্তায় নেমে আসা প্রতিবাদকারী তরুণ-তরুণীরা,

সেই সাহসী মানুষগুলো,

শহীদ ও আহতরা—

তাদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তাঁদের অভূতপূর্ব ত্যাগ ছাড়া এই পরিবর্তন সম্ভব হতো না।

এই প্রক্রিয়া সফল করতে দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই সহযোগিতা করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ, নির্বাচন কমিশন, সকল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রশাসনের প্রতিটি স্তরের সদস্যরা আন্তরিক সহযোগিতা

করেছেন। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। আপনাদের ধৈর্য, পেশাদারিত্ব ও আস্থার ওপর ভর করেই এই পথচলা সম্ভব হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের সময় দেয়ালে দেয়ালে তরুণরা যে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন এঁকেছিল—তার কেন্দ্র ছিল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। সেই প্রত্যাশা বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তী সরকার প্রায় ১৩০টি নতুন আইন ও সংশোধনী প্রণয়ন করেছে এবং প্রায় ৬০০টি নির্বাহী আদেশ জারি করেছে, যার প্রায় ৮৪ শতাংশ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।

এই সংস্কারসমূহ নাগরিক অধিকারকে সংহত করেছে, বিচারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে এবং গুম, খুন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার সংস্কৃতি যেন আর কখনো ফিরে না আসে সেটা নিশ্চিত করেছে।

আমরা দায়িত্ব গ্রহণের সময় দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত ভঙ্গুর। থানাগুলো ছিল পুলিশশূন্য, জনগণের মধ্যে আস্থার বদলে ভয় ও শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। ধাপে ধাপে আমরা সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছি।

আজ পুলিশ আর মারণাস্ত্র ব্যবহার করে না, বেআইনিভাবে কাউকে তুলে নিয়ে যায় না, ‘বন্দুকযুদ্ধের’ নামে হত্যা করে না, পুলিশ ও গোয়েন্দাবাহিনীর ভয়ে কাউকে ডিলিট বাটন চাপতে হয় না। জনবান্ধব ও জবাবদিহিমূলক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে পৃথক সচিবালয় গঠন, বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছ কাঠামো এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে যুগান্তকারী সংস্কার করা হয়েছে।

সেপারেশন অব জুডিশিয়ারির জন্য মাজদার হোসেন মামলার রায় আমরা বাস্তবায়ন করে গেলাম।

গুমকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করা হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করতে রায় সরাসরি সম্প্রচারের সুযোগ, বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ এবং অন্তর্বর্তী আপিলের বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ যেন আর কখনো মানবাধিকারহীন রাষ্ট্রে পরিণত না হয়—সে লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে এবং কমিশন গঠন করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

একটি সমাজ তখনই উন্নত হয়, যখন তার নারীরা নিরাপদ, সম্মানিত ও সমান অধিকারপ্রাপ্ত হন। উন্নয়ন তখনই টেকসই হয়, যখন নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে, অর্থনীতিতে, শিক্ষায় ও নেতৃত্বে সমানভাবে অংশ নিতে পারেন। যে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখছি নারীদের অগ্রযাত্রা ছাড়া তা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

নারী ও শিশুর সুরক্ষায় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ অধ্যাদেশ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধন করা হয়েছে। নতুন এসব আইনের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার পথ সুগম করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

অভ্যুত্থান–পরবর্তী এক উত্তাল সময়ে দেশকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্যরা যে ধৈর্য, পেশাদারিত্ব ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

একইসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই—যখনই কোনো সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তখনই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমাদের আহ্বানে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়েছেন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও সংযমই দেশকে অস্থিরতার পথ থেকে স্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হয়েছে।

স্বৈরাচারের ১৬ বছরে এদেশের রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা যে ভয়াবহ নিপীড়ন, মামলা–হামলা, গুম ও হত্যার শিকার হয়েছেন, তা আমাদের জাতির জন্য এক গভীর ও বেদনাদায়ক শিক্ষা। এই অভিজ্ঞতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—যাতে ভবিষ্যতে আর কখনো কোনো জালেম মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, যেন আর কখনো ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত না হয়, শত শত আয়নাঘর সৃষ্টি না হয়, বিচারবহির্ভূত হত্যা ফিরে না আসে—সেজন্য কেবল রাজনৈতিক অঙ্গীকারই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচারব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মৌলিক ও গভীর সংস্কার। এই উপলব্ধি থেকেই অন্তর্বর্তী সরকার তার সংস্কার কর্মসূচিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

ফ্যাসিস্ট সরকারের ১৬ বছরের নিপীড়ন ও জুলাইয়ের রক্তাক্ত স্মৃতি এখনো আমাদের মাঝে তাজা হয়ে আছে। যারা ভয়াবহ নিপীড়ন ও নির্যাতন চালিয়েছে তাদের বিচার করা এবং যেন আর কেউ এ ধরনের দুঃশাসন কায়েম করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা আমাদের গুরুদায়িত্ব।

বিচার একটা চলমান প্রক্রিয়া। একাধিক ট্রাইবুনাল বর্তমানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যেই একাধিক মামলার রায় ঘোষণা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ফ্যাসিবাদের সময়ে দেশে যে গুমের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল সেই ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচারও শুরু হয়েছে। বেশকিছু মামলার বিচারিক কার্যক্রম এখন শেষের পথে। আমরা আশা করছি, আগামী দিনগুলোতেও বিচারিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে এগিয়ে যাবে।

প্রিয় দেশবাসী,

অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় অর্জন জুলাই সনদ, যার ভিত্তিতে গণভোটে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত দিয়েছে দেশের মানুষ। জুলাই সনদের বাস্তবায়ন হলে ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার পথগুলো চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আশা করব এটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ছোটবড় ভালোমন্দ অনেক কথা ভুলে গেলেও জুলাই সনদের কথা জাতি কখনো ভুলবে না। এই সনদ রচনা এবং গণভোটে পাশ করানোর জন্য আমি সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, অধিকার রক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তাদের সবাইকে আজ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রবাসীদের ভোট দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন একজন ভোটার গর্বভরে এই নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দেয়ার অভিজ্ঞতা সোশ্যাল মিডিয়ায় বলে তখন একজন নাগরিক হিসেবে আমি আনন্দ ধরে রাখতে পারি না। আমি আশা করি, এই প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশি প্রবাসীরা নিশ্চিন্তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা দায়িত্ব গ্রহণের সময় অর্থনীতি ছিল বিপর্যস্ত। ব্যাংকিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, অর্থপাচার ছিল লাগামহীন। আমরা রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, করনীতি, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক খাতে কাঠামোগত সংস্কার এনেছি।

তলাবিহীন অর্থনীতি আমাদের জন্য রেখে গেছিল আগের ফ্যাসিবাদী সরকার। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংককে ফতুর করে দিয়ে গেছে। ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার করে নিয়ে গেছে। বিশাল ঋণের বোঝা রেখে গেছে। এসব আমাদের জানা কথা। আমরা যারা এই অর্থনীতি আবার চালু করার দায়িত্ব পেয়েছিলাম তারা দিশা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

এখন যাবার সময় স্বস্তি পাচ্ছি যে আমরা অবস্থার মোকাবিলা করতে পেরেছি। এবং নতুন অর্থনীতির বুনিয়াদ রচনা করে রেখে যেতে পারছি। এখন আর পাওনাদাররা আমাদের তাড়া করতেও আসবে না। আন্তর্জাতিক লেনদেনে আমরা চোখে অন্ধকার দেখব না। আমাদের রিজার্ভের পরিমাণ এখন ৩৪ বিলিয়ন ডলার। আমাদের দেশপ্রেমিক প্রবাসী ভাই-বোনদের রেমিট্যান্সের টাকায় এই রিজার্ভ ক্রমেই বাড়ছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে। টিসিবির কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। বাজার তদারকি ও মজুতদারির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

শ্রমিক অধিকারকে মানবাধিকারের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশনসমূহ অনুসমর্থন করা হয়েছে—যা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করবে। যুগান্তকারী নতুন শ্রম আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রবাসীরা আমাদের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণে আইন সংশোধন, বিদেশে আইনি সহায়তা, নতুন শ্রমচুক্তি এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বন্দর ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ কাঠামোতে আমূল সংস্কারের মাধ্যমে ইউরোপীয় সর্ববৃহৎ বিনিয়োগসহ একাধিক কৌশলগত প্রকল্প এগিয়েছে। ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে গভীর সমুদ্রবন্দর, মৎস্য ও আধুনিক টাউনশিপ উন্নয়নে নতুন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় স্বার্থ ও দেশের মর্যাদা—এই তিনটি মূল ভিত্তি আমরা দৃঢ়ভাবে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। নতজানু পররাষ্ট্রনীতি কিংবা অপর দেশের নির্দেশনা ও পরামর্শনির্ভর বাংলাদেশ এখন আর নয়—আজকের বাংলাদেশ নিজের স্বাধীন স্বার্থ রক্ষায় আত্মবিশ্বাসী, সক্রিয় ও দায়িত্বশীল। বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মান ও স্বার্থের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একইসঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আজ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রোহিঙ্গা সংকট আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনীতির ওপর একটি গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। দুঃখজনকভাবে, দীর্ঘ সময় ধরে এই সংকট নিরসনে

কোনো কার্যকর ও সমন্বিত আন্তর্জাতিক উদ্যোগ দৃশ্যমান ছিল না। দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মৃতপ্রায় এই ইস্যুটিকে পুনরায় বিশ্ব মনোযোগের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

এই সংকটের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতিসংঘ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব নিজে বাংলাদেশ সফর করেছেন এবং সমস্যার টেকসই সমাধানে সহায়তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। আমার অনুরোধে জাতিসংঘে রোহিঙ্গা বিষয়ে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী শাসনামলে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা ও আধুনিকীকরণের বিষয়টি পরিকল্পিতভাবে উপেক্ষিত ছিল। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই সেই অবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করতে পেরেছি। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বর্তমান সরকার সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিকায়ন এবং যেকোনো ধরনের আগ্রাসন কার্যকরভাবে মোকাবিলার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে উপযোগী করে গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া হলেও বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় বহির্বিশ্বের সম্ভাব্য হুমকি ও আগ্রাসন মোকাবিলার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার তার সীমিত মেয়াদের মধ্যে সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌ বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—এই উদ্যোগগুলোর ধারাবাহিকতা ভবিষ্যতের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারসমূহও অব্যাহত রাখবে। যাতে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা দীর্ঘমেয়াদে নিশ্চিত করা যায়।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশ এখন আর কেবল সংকট থেকে উত্তরণের গল্প নয়। বাংলাদেশ আজ অমিত সম্ভাবনার দেশ।

আমাদের ছেলে-মেয়েরা অসীম সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। এটি সাহসী, সৃজনশীল, উদ্যমী তরুণদের দেশ। তাদের দরকার উপযুক্ত শিক্ষা, বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ এবং এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা—যেখানে মেধা ও পরিশ্রম ও সততার মূল্য আছে।

সারাবিশ্বে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক দক্ষ, কর্মঠ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মীর প্রয়োজন তৈরি হচ্ছে। আর বাংলাদেশে আছে কর্মক্ষম বিপুল তরুণ সম্প্রদায়।

আমরা যদি এই বৈশ্বিক চাহিদা পূরণে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তাহলে জাপান, কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকাসহ সবাই চাইবে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদের শ্রম, মেধা ও সৃজনশীলতা ব্যবহার করতে। আমরা হয়ে উঠতে পারি তাদের জন্য পছন্দের একটি নির্ভরযোগ্য দক্ষ জনশক্তি সরবরাহকারী দেশ।

আমাদের খোলা সমুদ্র কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা নয়— এটি বাংলাদেশের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উন্মুক্ত দরজা। নেপাল, ভূটান ও সেভেন সিস্টার্সকে নিয়ে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল, বাণিজ্যিক চুক্তি ও শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশের সুযোগের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে একটি বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমাদের বন্দরগুলোর দক্ষতা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেবার জন্য সেরা আন্তর্জাতিক বন্দর পরিচালনা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির কাজে অনেক এগিয়ে এসেছি। এর দক্ষতা বাড়াতে না পারলে আমরা অর্থনৈতিক অর্জনে পিছিয়ে যাবো।

প্রিয় দেশবাসী,

সম্প্রতি বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এই চুক্তি কেবল একটি বাণিজ্যিক সুবিধা নয়; এটি বাংলাদেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক অবস্থানকে দীর্ঘমেয়াদে শক্তিশালী করার জন্য একটি কৌশলগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

এই চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য পারস্পরিক শুল্কভার রেসিপরোকাল ট্যারিফ ৩৭% থেকে ১৯%-এ কমে এসেছে।

এই চুক্তির একটি বিশেষ দিক হলো—যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত তুলা ও কৃত্রিম তন্তু ব্যবহার করে তৈরি পোশাক পণ্যে শূন্য পারস্পরিক শুল্ক সুবিধা। এটা একটা মস্ত বড় সুবিধা। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্ক সুবিধা পাওয়ায় বাংলাদেশি পোশাক আরও কম দামে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করবে; যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহারের ফলে আমাদের সরবরাহ চেইন আরও বৈচিত্র্যময় ও স্থিতিশীল হবে; এটি বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে উচ্চমূল্যের ও উন্নতমানের পণ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দেবে।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত টেকসই, বৈচিত্র্যময় ও প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যে জাপানের সঙ্গে সম্পাদিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি একটি ঐতিহাসিক ও কৌশলগত অগ্রগতি। এই অংশীদারিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুফল হলো উৎপাদন ও রপ্তানির বহুমুখীকরণ।

জাপানের সঙ্গে সহযোগিতার ফলে অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক্স, রেলওয়ে সরঞ্জাম, গ্রিন টেকনোলজি এবং উচ্চমূল্যের শিল্পপণ্যে বাংলাদেশ ধাপে ধাপে যুক্ত হতে পারবে। এতে আমাদের ঝুঁকি কমবে এবং বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে। পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলো আমাদের দেশে বিনিয়োগ করবে শুধু জাপানে শুল্কমুক্ত রফতানির সুবিধা গ্রহণ করার জন্য।

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা চীনের সাথে আমাদের উন্নয়ন সহযোগিতা গভীরতর করেছি। গত বছর মার্চে বেইজিংয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাথে বৈঠকে আমরা দুদেশের মধ্যকার কৌশলগত অংশীদারিত্বকে নতুন পর্যায়ে উন্নীত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি। ইতোমধ্যে তিস্তা নদীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পুর্নবাসন প্রকল্পের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। নীলফামারিতে এক হাজার শয্যার একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল তৈরিতে দুদেশ একমত হয়েছে, এ কাজটি আমরা এগিয়ে নিতে পেরেছি।

আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যে বাংলাদেশ শুধু স্বল্পমূল্যের শ্রমনির্ভর অর্থনীতি নয়—বরং দক্ষতা ও প্রযুক্তি ও মূল্য সংযোজনভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হবে।

তবে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই—

এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নিতে হলে তিনটি বিষয়ের কোনো বিকল্প নেই:

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সততা।

অতীতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সীমাহীন দুর্নীতি, অসততা, অনিয়ম ও জালিয়াতিকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। সেই সংস্কৃতি আমাদের পেছনে টেনে রেখেছিল, আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করেছিল।

নতুন বাংলাদেশকে সেই পথ থেকে সরে আসতে হবে। আমাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে নিয়ম মানায়, প্রতিশ্রুতি রক্ষায়, মান বজায় রাখায়, রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করায়, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করায়।

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা শূন্য থেকে শুরু করিনি—শুরু করেছি মাইনাস থেকে। ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করে প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে তারপর সংস্কারের পথ ধরেছি। আজ অন্তর্বর্তী সরকার বিদায় নিচ্ছে। কিন্তু গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা, বাকস্বাধীনতা ও অধিকার চর্চার যে ধারা শুরু হয়েছে—তা যেন কখনো থেমে না যায়।

আমরা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ছেড়ে গেলেও নতুন বাংলাদেশ গড়ার সার্বিক দায়িত্ব আমার, আপনার, আমাদের সবার। আমাদের সকলের দায়িত্ব দেশকে সত্যিকারের গণতন্ত্র হিসেবে পরিস্ফুটিত করা।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান আমাদের জন্য এই দরজা খুলে দিয়েছে, আমরা যদি স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না।

গণ-অভ্যুত্থানে যারা প্রাণ দিয়েছে, শরীরের অঙ্গ হারিয়ে দুঃসহ জীবনযাপন করছে, যাদের লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, যাদের লাশ এখনো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যারা অল্পের জন্য বেঁচে গেছে তাদের সকলের আত্মত্যাগকে এ জাতি যেন কোনোদিন ভুলে না যায়। প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমরা যেন তাদের ছবি মনে রেখে সিদ্ধান্ত নিই। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ক্ষমতাবানদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় সে শিক্ষাটি যেন দিয়ে যেতে পারি।

ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা মানুষকে কীরকম মনুষ্যত্বহীন করে তুলতে পারে সেটা জাতির ইতিহাসে ধরে রাখার জন্য আমরা পলাতক প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান গণভবনকে জাতীয় জুলাই স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে যাচ্ছি।

এখানে আপনাদের স্মৃতির বাস্তব নমুনা সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। জাদুঘর যখন জনসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হবে তখন আপনি যেখানেই থাকুন দেশে থাকুন, বিদেশে থাকুন- আমি অনুরোধ করব আপনি সপরিবারে একবার এসে কিছুক্ষণ জাদুঘরে কাটিয়ে যাবেন।

প্রিয় দেশবাসী,

আসুন, আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ি—যেখানে সম্ভাবনা সীমাহীন, আর স্বপ্নের কোনো সীমানা নেই।

গত ১৮ মাসে ক্রমান্বয়ে এদেশের মানুষের মধ্যে গণতন্ত্র, একটি কল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থা, বাক-স্বাধীনতা, ক্ষমতাকে প্রশ্ন করতে পারা-সমালোচনা করতে পারা, জবাবদিহিতায় আনতে পারার যে চর্চা শুরু হলো, উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন আয়োজন করে জনগণের অধিকার নিশ্চিত হলো। এই ধারা যেন কোনোরকমেই হাতছাড়া হয়ে না যায়।

আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের আপামর জনগণ এবং সকল রাজনৈতিক পক্ষ ইস্পাত কঠিন ঐক্যের মাধ্যমে এই ধারাকে আগামী দিনগুলিতে রক্ষা করবে, সমৃদ্ধ করবে।

অধিকারের বিষয়ে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিষয়ে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে দৃঢ় থাকতে হবে।

দল-মত, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে আহ্বান জানাই—একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে।

এই আহ্বান জানিয়েই আমি অত্যন্ত আশাবাদের সঙ্গে বিদায় নিচ্ছি।

দেশের শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রী, নারী-পুরুষ, নবীন-প্রবীণ— আমার দায়িত্ব থেকে বিদায় নেবার এই প্রাক্কালে আপনাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার জন্য দোয়া করবেন।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন।

আল্লাহ হাফেজ।